খুলনার নির্বাচনী রাজনীতি

জোটে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে চায় ১৪ দল

এবি সিদ্দিক টিটো

খুলনার এখনকার রাজনীতিতে রয়েছে আলাদা আর্ট। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চেয়ে কিছুটা ভিন্নতর। কখনো উত্তপ্ত আবার কখনো পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে চলছে খুলনার রাজনীতি।

২০০১ সালের নির্বাচনে খুলনার ৬টি আসনের মধ্যে ৫টি পায় চারদলীয় জোট। আওয়ামী লীগ ১টি আসনে বিজয়ী হয়। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ চায় যেকোনোভাবে আসন পুনরুদ্ধার করতে। অপরদিকে চারদলীয় জোট যেকোনো মূল্যে আসন ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট রয়েছে।

বিএনপিতে চলছে তীব্র গ্রুপিং। এক গ্রুপে মাজেদ-লবী, অপর গ্রুপে দাদু-মঞ্জু।

গ্রুপিংয়ের উর্ধ্বে নয় আওয়ামী লীগও। তবে প্রকাশ্যে তেমনটা নেই। যে কারণে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে আছে অনেকটা। আগামী নির্বাচন ঘিরে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। উভয় দলই নানা ছক কষে এগিয়ে যাচ্ছে।

খুলনা-১ (দাকোপা-বটিয়াঘাটা)

২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী পঞ্চানন বিশ্বাস সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিই খুলনা জেলার একমাত্র আওয়ামী সাংসদ।

খুলনা জেলার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলা নিয়ে গঠিত খুলনা-১ আসন। এটি খুলনায় আওয়ামী লীগের রিজার্ভ আসন হিসেবেই বিবেচিত হয়। যেহেতু সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত খুলনা-১।

২০০১ সালের নির্বাচনে ৭৮ হাজার ৫৪১ ভোট পেয়ে পঞ্চানন বিশ্বাস নিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চারদলীয় জোটের আমির এজাজ খান। তিনি ভোট পেয়েছিলেন ৪৭ হাজার ৫২২। সিপিবির অধ্যাপক অচিন্ত বিশ্বাস পান ১৮ হাজার ৫০৬ ভোট। জাতীয় পার্টির (এরশাদ) আবুল হোসেন পান ৬ হাজার ৫৬০ ভোট।

১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রচন্ড কোন্দল থাকায় দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে প্রার্থী হন। ৬২ হাজার ২৪৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। সে সময় সিপিবির অচিন্ত বিশ্বাস ১৮ হাজার ৩৯৮ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন। বিএনপির প্রফুল্ল কুমার ১১ হাজার ৯১০ ভোট পেয়েছিলেন। পরে শেখ হাসিনার আসনটি ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে দলীয় মনোনীত প্রার্থী শেখ হারুনের বিরুদ্ধে দলের বিদ্রোহী প্রার্থী পঞ্চানন বিশ্বাস জয়লাভ করেন।

সিদ্ধান্ত অমান্যের কারণে সে সময় পঞ্চাননকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, পরে বিজয়ী হলে আবার দলে ফিরিয়ে নেয়।

সাংসদ পঞ্চানন বিশ্বাস আগামী নবম সাংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে এবার তাকে মনোনয়ন পেতে ভীষণ বেগ পেতে হবে। দাকোপা-বটিয়াঘাটার বর্তমান রাজনীতি পুরোপুরি পঞ্চাননের বিরুদ্ধে। দাকোপ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ননী গোপাল মন্ডল ইতিমধ্যে নিজের শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করেছেন।

এ আসনে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নিজেদেরকে দুই উপজেলায় ভাগ করে ফেলেছে। তারা দাকোপা আওয়ামী লীগ ও বটিয়াঘাটা আওয়ামী লীগ হিসেবেই নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর খুলনায় যখন আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব নিয়ে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছিল, সে সময় জেলা আওয়ামী লীগ সভায় শেখ হারুনুর রশীদ সাহসের সঙ্গে সমগ্র খুলনা জেলায় দলের সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়েছেন, দলকে শক্তভাবে দাঁড় করিয়েছেন। অপারেশন ক্লিনহার্ট থেকে শুরু করে বিরোধী নেতা-কর্মীদের সাহস যুগিয়েছেন। নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করেছেন।

খুলনা-১ আসনে স্থানীয় বিএনপির একাধিক নেতা দলের মনোনয়ন প্রত্যাশা করলেও জোটের প্রার্থী হিসেবে আমীর এজাজ খানের মনোনয়ন এবারও প্রায় নিশ্চিত। দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশে তিনি ওয়ার্ড পর্যায়ে নিয়মিত গণসংযোগ করছেন। বিগত নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে সম্মানজনক ভোট পেয়ে তিনি চমক সৃষ্টি করেছিলেন। তবে বিএনপি নেতা প্রফুল্ল রায়ও দলীয় মনোনয়নের দাবিদার হিসেবে মাঠে রয়েছেন। এ আসনে সিপিবির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোটার রয়েছে। জাতীয় পার্টি এরশাদ থেকে কেন্দ্রীয় নেতা আবুল হোসেন নির্বাচন করতে পারেন। আবার নতুন মুখও জাপার প্রার্থী হতে পারে।

খুলনা-২ (সদর-সোনাডাঙ্গা)

খুলনা-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সংকট তীব্র। আর বিএনপির একাধিক প্রার্থীর ভিড়ে নিজের ঘর সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বরাবরই এ আসনে বিএনপির অভ্যন্তরে ব্যাপক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

১৯৭৩ সালের পর থেকে খুলনা সদর আসনটি আওয়ামী লীগের হাতছাড়া। এক কথায় এটি আওয়ামীবিরোধী আসন হিসেবে বিবেচিত। এখান থেকে কখনও মুসলিম লীগ, কখনো বিএনপি আবার কখনো জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের প্রচুর রিজার্ভ ভোট রয়েছে যা সঠিকভাবে কোন প্রার্থীই কাজে লাগাতে পারেননি।

এ আসনটি 'ভিআইপি' আসন হিসেবে বিবেচিত। ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রচন্ড দলীয় কোন্দলের কারণে বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া নিজেই প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হন। তিনি একাধিক আসনে

শেখ তৈয়বুর রহমান

শেখ হারুনুর রশিদ

বিজয়ী হওয়ায় খুলনা-২ আসনটি ছেড়ে দেন। পরে আলী আসগর লবী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

নির্বাচিত হবার পর থেকেই খুলনা বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে লবীর মতবিরোধ দেখা দেয়। এ সময় লবী ও অধ্যাপক মাজেদুর রহমান একটি গ্রুপ নিয়ে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। অপর গ্রুপে রয়েছেন বিলুপ্ত মহানগর বিএনপি সভাপতি সাংসদ এম নূরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু।

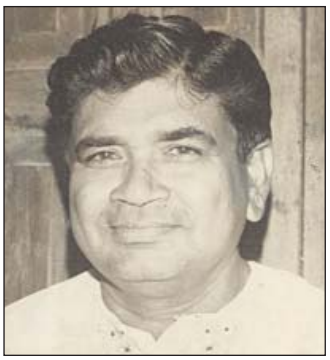

পঞ্চানন বিশ্বাস

আলী আসগর লবী

এ আসেন বেগম খালেদা জিয়া ৯১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম পেয়েছিলেন ৬১ হাজার ৯৭৫ ভোট।

১৯৯৬ সালে বিএনপি প্রার্থী (তৎকালীন স্পিকার) শেখ রাজ্জাক আলী ৫৫ হাজার ৩৫১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মরহুম অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম ৫৪ হাজার ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। জামায়াত প্রার্থী আনছার উদ্দীন পেয়েছিলেন ৮ হাজার ৪২৬ ভোট এবং জাতীয় পার্টির মিয়া মুসা হোসেন ৭ হাজার ৩৫৩ ভোট পেয়েছিলেন।

এ আসনে ১৯৯১ সাল থেকে বিএনপির প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ২০০১ সালে নির্বাচনের আগে দলের মধ্যে যে প্রচন্ড বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, এবারের পেক্ষাপট তৎকালীন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমান এমপি লবীর সঙ্গে নেতা-কর্মীদের বেশ দূরত্ব রয়েছে। খুলনায় বিএনপির নিজস্ব অফিস থাকা সত্ত্বেও সাংসদ আলী আসগর লবী ও মেয়র আলাদা অফিস চালু করেছেন।

সাংসদ লবী নবম সংসদ নির্বাচনেও প্রার্থী হতে চাচ্ছেন। কিন্তু মনোনয়ন পাবার ক্ষেত্রে এবার তাকে শক্ত বাধা পার হতে হবে। মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু শক্তিশালী প্রার্থী হিসেবে নিজের অবস্থান সুসংহত করেছেন। খুলনার রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্লিন ইমেজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খুলনা সিটি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান এবং সাবেক স্পিকার ও দুবার নির্বাচিত সাংসদ শেখ রাজ্জাক আলী এ আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। নজরুল ইসলাম মঞ্জু সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'এবার আর কোনো সিজনাল বার্ডকে (মৌসুমী অতিথি পাখি) খুলনা-২ আসন থেকে প্রার্থী হতে দেয়া যাবে না। আমরা আর ছাড় দেব না। আমরা চাই প্রকৃত রাজনীতিবিদরা

সংসদে যাক।'

এ আসনে প্রার্থী মনোনয়নে শাসক দল বিএনপিতে প্রচন্ড কোন্দল থাকলেও বিরোধী দল আওয়ামী লীগের চিত্র ভিন্ন। এখানে আওয়ামী লীগে যোগ্যতর তেমন উল্লেখযোগ্য প্রার্থী নেই। এ বিষয়ে খুলনার আওয়ামী লীগ নেতারা যোগ্যতর প্রার্থী খুঁজছেন।

আওয়ামী লীগ থেকে ইতিপূর্বে এ আসনে তিন দফা নির্বাচন করেন মরহুম অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম। তিনি সন্ত্রাসীদের গুলি ও বোমায় নিহত হবার পরই প্রার্থী সংকটে ভুগছে খুলনা আওয়ামী লীগ।

খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি তালুকদার আব্দুল খালেক সাপ্তাহিক-২০০০-কে বলেন, 'খুলনা-২ আসনে কে নির্বাচন করবে সেটা একমাত্র দলীয় প্রধান শেখ হাসিনাই সিদ্ধান্ত নেবেন।' শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনও প্রার্থী হতে পারেন। এছাড়াও খুলনা মহানগরী আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মিজানুর রহমান মিজান প্রার্থী হতে আগ্রহী। অন্য যারা মনোনয়ন চাইবেন বলে শোনা যাচ্ছে তারা হলেন সাবেক সাংসদ অ্যাভোকেট এনায়েত আলী, সদর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ওয়ার্ড কমিশনার আজমল আহমেদ তপন এবং ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এসএম মোর্তুজা রশিদী দারা।

খুলনা-৩ (দৌলতপুর-খালিশপুর)

খুলনার শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত খালিশপুর-দৌলতপুর। এখানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঘুরেফিরে বিজয়ী হয়।

২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট প্রার্থী মোঃ আশরাফ হোসেন ৭২ হাজার ২৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক সাংসদ কাজী সেকেন্দার আলী ডালিম। তিনি ৫৫ হাজার ৭৯৫ ভোট পেয়েছিলেন। ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট নেতা মোঃ মোখতার হোসেন জাতীয় পার্টির (এরশাদ) লাঙ্গল প্রতীকে ১০ হাজার ৩০৫ ভোট পেয়েছিলেন।

'৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কাজী সেকেন্দার আলী ডালিম ৩৯ হাজার ৩৩২ ভোট পেয়ে জয়ী হন। বিএনপির আশরাফ হোসেন পান ৩৭ হাজার ৭৮০ ভোট। '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির এসএম রব পেয়েছিলেন ২৮ হাজার ৬৯৩ ভোট এবং জামায়াতের গোলাম পরওয়ার পান ৭ হাজার ৮৯৮ ভোট।

খালিশপুর ও দৌলতপুরের শিল্পাঞ্চল নিয়ে গঠিত খুলনা-৩ সংসদীয় আসন। এখানকার ভোটারদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন শিল্প কারখানার শ্রমিক জনগোষ্ঠী।

দীর্ঘদিন ধরে খুলনার শিল্প কলকারখানা বন্ধ রয়েছে। এসব মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

আর তাদের এ দুরবস্থা সৃষ্টিকারীরা আবার নতুন খেলায় মেতে উঠেছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খুলনার বন্ধ হওয়া কলকারখানা চালুর নামে নতুন করে শুরু হয়েছে ধান্দাবাজি আর প্রহসন। এসব নিয়ে শাসক দলের ওপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-কর্মচারীরা ও তাদের পরিবার-পরিজন।

বরিশাল, ভোলা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চল থেকে লোকজন এখানে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় এসেছিল। এই শ্রমিক নামধারী ভোটারদের ভোটেই খুলনা-৩ আসনের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। তারা কখনো বিএনপিকে ভোট দেয়, আবার পরেরবার আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বিএনপি থেকে এবারও প্রার্থী হবেন সাংসদ আশরাফ হোসেন। তবে দল থেকে মনোনয়ন চাইবেন খুলনার মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান। আওয়ামী লীগ থেকে প্রার্থী হবার জন্য মনোনয়ন চাইবেন সাবেক সাংসদ কাজী সেকেন্দার আলী ডালিম। কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, কেন্দ্রীয় নেতা এসএম কামাল হোসেন, মহানগর যুগ্ম সম্পাদক খান ইবনে জামান, শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সরদার মোতাহার উদ্দিন এলাকায় নিয়মিত গণসংযোগ করছেন। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির ঐক হলে জাতীয় পার্টি নেতা আব্দুল গাফফার বিশ্বাসকে ছাড় দিতে পারে আওয়ামী লীগ।

খুলনা-৪ (রূপসা-তেরখাদা-দিঘলিয়া)

খুলনা-৪ আসনের বর্তমান সাংসদ মহানগর বিএনপির সভাপতি নূরুল ইসলাম দাদু। আগামী নির্বাচনেও তিনি মনোনয়ন চাইবেন। যদিও এ আসনে বিএনপির সাংগঠনিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়, তার ওপর রয়েছে দলীয় একাধিক প্রার্থী। অপরদিকে আওয়ামী লীগের জেলা সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা রশিদী সুজা একক প্রার্থী।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি নেতা এম নূরুল ইসলাম ১ লাখ ২ হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী এসএম

মোস্তফা রশিদী সুজা পেয়েছিলেন ৮০ হাজার ৩০০ ভোট। জাতীয় পার্টির মল্লিক মহিউদ্দিন ৬ হাজার ৩৯৬ ভোট পান।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মোস্তফা রশিদী সুজা ৫৯ হাজার ৫১৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। বিএনপির এম নুরুল ইসলাম পান ৫৭ হাজার ২১৬ ভোট। জামায়াতের মোঃ আব্দুল হামিদ পান ১২ হাজার ৬৫৫ ভোট। এছাড়াও মোল্লা জসিম উদ্দিন পান ১০ হাজার ৪৮৫ ভোট। মাওলানা সাখাওয়াত পেয়েছিলেন ৮ হাজার ৪৫৮ ভোট।

মোস্তফা রশিদী সুজা

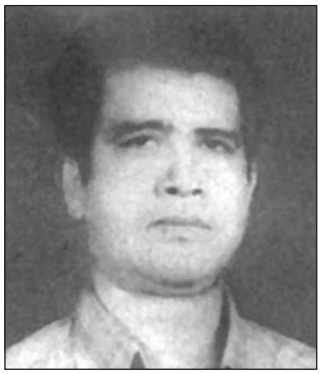

আজিজুল বারী হেলাল

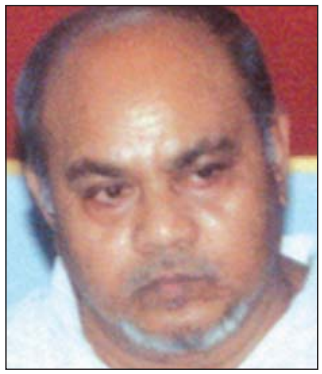

কর্ণেল (অবঃ) গাফফার বিশ্বাস

সন্ত্রাসের অবাধ বিচরণভূমি খুলনা জেলার রূপসা ও তেরখাদা উপজেলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে চরমপন্থিরা। বছরখানেক আগেও এ অঞ্চলে হত্যাকান্ড ছিল দিনের স্বাভাবিক ঘটনা। তবে পুলিশের অভিযান ও র‍্যাবের নিয়মিত নজরদারির ফলে আপাতত পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত।

দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক নেতাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলে তৎপর রয়েছে এমন দুটি পরস্পরবিরোধী চরমপন্থিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।

এসব চরমপন্থির হাতে খুলনার একাধিক রাজনৈতিক নেতাকে জীবন দিতে হয়েছে। এ কারণে এ আসনে নিষিদ্ধ দলগুলো নির্বাচনে বিশাল ভূমিকা রাখে।

আগামী সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির একাধিক সম্ভাব্য প্রার্থী হলেন বর্তমান সাংসদ বিলুপ্ত মহানগর সভাপতি এম নূরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক মাজেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মনা, মহানগর নেতা সাহারুজ্জামান মোর্তজা, কেন্দ্রীয় ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল। তবে তরুণ উদীয়মান প্রার্থী হিসেবে হেলালের অবস্থা সুসংহত। মনোনয়ন দৌড়ে তিনি এগিয়ে রয়েছেন।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা বেশ ভালো। দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে রয়েছে চমৎকার বোঝাপড়া।

এখন পর্যন্ত জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা রশিদী সুজা মনোয়ন দৌড় একক প্রার্থী।

খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা)

খুলনা-৫ আসনটি মূলত আওয়ামী লীগের বলে পরিচিত হলেও গতবারের নির্বাচনে খুলনা মহানগর জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার জোটপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন।

নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থি নেতা মৃণালকে ব্যবহার করে চারদলীয় জোট বলে অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগ তাদের হারানো আসন ফিরে পেতে চায়। এ আসনে জামায়াত চরমপন্থি কানেকশনের জোরে জয়ী হয়েছিল। গত নির্বাচনের আগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থি নেতাদের মধ্যকার বিরোধের কারণে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়। চরমপন্থি নেতাদের সঙ্গে সুকৌশলে সখ্য গড়ে তোলেন পরওয়ার। আর এ কাজে তাকে সহায়তা করেন তার ভাই গোলাম কুদ্দুস। ডুমুরিয়ায় মৃণালের সঙ্গে জামায়াতের গোপন বৈঠকের মাধ্যমে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে আওয়ামী দুর্গে ধস নামান। নির্বাচনের কয়েক দিন আগে ডুমুরিয়ায় কুকুরের মাথায় টুপি পরানো সংক্রান্ত সাজানো গল্প ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। সৃষ্টি হয় ব্যাপক উন্মাদনা। ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে জয়লাভ করে জামায়াত।

যদিও পরোয়ার সংবাদ মাধ্যমে এসব অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করেছেন। এমপিপুত্রের সন্ত্রাসী পালন, উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্নভাবে অর্থ আদায় ওপেন সিক্রেট। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হারুনুর রশিদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন 'খুলনায় জোট সরকার বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের উপর যেভাবে নির্যাতন করেছে তাতে দলীয় কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করছে। আমার বিশ্বাস নির্বাচনে খুলনার ছয়টি আসনে চৌদ্দ দলের প্রার্থীরা বিজয়ী হবে।'

এ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রার্থী হবার জন্য একাধিক নেতা জনসংযোগ করে চলেছেন। এ আসন থেকে নারায়ণ চন্দ্র জেলা সভাপতি শেখ হারুনুর রশিদ এবং জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক নেতা গাজী আব্দুল হাদি জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

খুলনা-৬ (কয়রা-পাইকগাছা)

খুলনা-৬ আসনে এককভাবে কোনো দলই শক্তিশালী নয়। এখানে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় জোটের যেমন একাধিক প্রার্থী রয়েছেন, তেমনি চারদলীয় জোটে রয়েছে একাধিক প্রার্থী।

খুলনা-৬ আসনটি খুলনার মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল। জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। অত্যন্ত দুর্গম এলাকা বলে পরিচিত সুন্দরবনের পাশ ঘেষে এ অঞ্চল অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ১০০ কিলোমিটার কয়রা-পাইকগাছা এলাকা নিয়ে গঠিত।

সুন্দরবন ঘেঁষা কয়রা-পাইকগাছা উপজেলায় আওয়ামী লীগের অবস্থান অত্যন্ত ভালো, তবে এখানে জামায়াতের অবস্থান আদর্শগত বা সাংগঠনিকভাবে সুসংহত না হলেও জামায়াত নেতা সাংসদ শাহ রুহুল কুদ্দুসের ব্যক্তি জনপ্রিয়তার জন্য জামায়াতের অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে।

গত ২০০১ সালের নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে শাহ রুহুল কুদ্দুস ১ লাখ ২৭ হাজার ৮১১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের শেখ নুরুল হক পান ৮৯ হাজার ২৭৯ ভোট।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শেখ নুরুল হক ৫৫ হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান সাংসদ শাহ রুহুল কুদ্দুস ৪৯ হাজার ২৩ ভোট পেয়েছিলেন। জাতীয় পার্টির স.ম. বাবর আলী পান ৩৮ হাজার ৪৭৬ ভোট, বিএনপি নেতা জিএম সবুর পেয়েছিলেন ১৬ হাজার ৮৩৫ ভোট।

বিগত দিনের যতোই পরিসংখ্যান থাকুক না কেন, এবারের নির্বাচন হবে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এবার এখান থেকে বিএনপির পক্ষে মনোনয়নের প্রবল দাবিদার সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী। এ আসন থেকে তিনি নির্বাচন করবেন।

এ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হবার জন্য চেষ্টা করছেন জেলা সভাপতি শেখ হারুনুর রশীদ, অ্যাডভোকেট সোহরাব আলী ও গাজী মোহাম্মদ আলী। আবার মহাজোট প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে যাবেন জাপার স.ম. বাবর আলী।

এ অঞ্চলে আওয়ামী লীগের প্রবল জনসমর্থন থাকলেও মূলত দলীয় সমঝোতার অভাবেই আসনটি বারবার হারাতে হচ্ছে। আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণে জনসমর্থন বেশি থাকার পরও এখানে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হতে পারেনি।

প্রতি নির্বাচনেই খুলনার রাজনীতিতে ফলাফলে পরিবর্তন ঘটে। যে দল বেশিসংখ্যক আসন লাভ করে, পরেরবার ফলাফল উল্টে যায়। সঙ্গত কারণেই এবার বিএনপি খুলনার আসন ধরে রাখতে আগ্রহী আর আওয়ামী লীগ সবগুলো আসনে বিজয়ী হতে চায়।